Course Module

SEMESTER-IV

Course : History Hons

Paper : CC-XI (Unit-3)

Teacher : Nilendu Biswas

Topic : Eighteen Century Economy

❖ **অষ্টাদশ শতকে কৃষি ও শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণ ঃ** অষ্টাদশ শতকের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অবক্ষয় তৎকালীন ভারতবর্ষের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল না । তখন কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়নি এবং ভূমিরারাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণও হ্রাস পায়নি । বরং বাংলার মত অনেক জায়গায় অর্থনীতির বিপরীত চিত্র চোখে পড়ে । বাংলায় ভূমি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল । মুর্শিদকুলি খাঁ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করতে সক্ষম হন । দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলে বদন সিংহ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করেছিলেন । রাজস্ব আদায়ের কঠোরতার তত্ত্ব মেনে নিয়েও এই সমস্ত ঘটনাকে সমৃদ্ধ অর্থনীতির প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় । ঐতিহাসিক মুজাফফর আলমের বিবরণ অনুযায়ী অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অযোধ্যা, বেরিলি, মোরাদাবাদ, বেণারস প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষি জমির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

তবে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে চাষীদের নিজ প্রয়োজনভিত্তিক কৃষি বাজারি শক্তির চাপে ভেঙে পড়েছিল । এই সময়ে বহু চাষী পরিবার বীজ, সার ইত্যাদি কেনার জন্য মহাজনী ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন । কিন্তু মহাজনরা অত্যাধিক লাভের জন্য ধান, ডালের পরিবর্তে তামাক, রেশম, নীল, আখ, পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের উৎপাদনে চাষীদের বাধ্য করত । এইভাবে ক্রমশ কৃষির বাণিজ্যিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, অথচ তাসত্ত্বেও কৃষি প্রযুক্তি ছিল খুবই অনুন্নত । জমি অত্যাধিক উর্বর হওয়ায় ফলন ভালো হত এবং জমি হারাবার ভয়ে চাষীরা কোন প্রযুক্তি গ্রহণে অনিহা দেখাত । তাছাড়া করভারে জর্জরিত দরিদ্র কৃষকের পক্ষে উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব ছিল না । সম্ভবত কায়িক শ্রমের দ্বারা সস্তা ও সুলভ মানব শ্রম পাওয়া যেত বলে যন্ত্র ব্যবহারে বিরত ছিল ।

কৃষির মত অব্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যের ক্রামগত সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের বাণিজ্যিকরণ আরম্ভ হয়েছিল । বাজার ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে । বিশেষত বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পের স্থানীয়করণ গড়ে ওঠে । ক্রবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলেই শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটেছিল । শহরে কারিগররা সাধারণত প্রয়োজন ও রপ্তানির উপযোগী স্বতন্ত্র বস্ত তৈরি করতেন । স্থানীয় বাজারের জন্য সাধারণত নিকৃষ্ট মানের মোটা কাপড় তৈরি করা হত । কিন্তু বর্হিবাণিজ্যের জন্য দক্ষ কারিগররা শৌখিন ও উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরি করতেন । কারিগররা পন্য উৎপাদনের জন্য মহাজনের নিকট ঋণ নিতে বাধ্যথাকতেন । এই অগ্রিম ঋণ বা দাদন গ্রহণের মূল কারণ ছিল সম্প্রসারিত বা সম্প্রসারণশীল বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী কারিগরদের পুঁজির স্বল্পতা ।

অর্থনীতিবিদ কোলব্রুক মনে করেন, শ্রমবিভাজন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল পুঁজির অভাব । পুঁজির স্বল্পতার কারণেই একজন কারিগর তাঁর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা থেকে তৈরি পন্য বাজারে বিক্রি করা-- সবকিছুই নিজেকে করতে হত । অবশ্য বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাজন কিছুটা গড়ে উঠেছিল । কারণ সেখানে তাঁতি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের দিয়ে আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করিয়ে নিতেন । যদিও কারিগরী সংগঠনে এক একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে । ইরফান হাবিব অবশ্য কারিগরী সংগঠনে এক একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিষয়টি মেনে নেননি । তাঁর মতে, মোগল শাসকরা কারিগরদের একই পেশায় আবদ্দ রাখতে চাইতেন না । ফলে কারিগররা ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত নিজেদের পেশা পরিবর্তন করতে পারত ।

❖ **সামাজিক ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের প্রভাব ঃ** ঐতিয্য-নির্ভর ভারতীয় সমাজে অতীত যুগের চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় । সমগ্র দেশে একই ধরণের সংস্কৃতি অবশ্য ছিল না, অঞ্চলভেদে তারতম্য ছিল । ধর্ম, ভৌগোলিক সীমা, ভাষা, জাত-পাত ও গোষ্ঠীর বিভিন্নতার জন্য সংস্কৃতি ও সমাজের গঠনে বিভিন্নতা ছিল । তবে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল । বৈদিক চতুবর্ণ ছাড়া আরও নানা জাতি, উপজাতিতে হিন্দু সমাজ বিভক্ত ছিল । সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্ণের লোকেরাই ভোগ করত । কোন ভাবেই এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে গমন করা যেত না । অসবর্ণ বিবাহ সমাজ অনুমোদন করত না । বিভিন্ন জাতির লোকেরা একত্র ভোজন করলে জাতি নষ্ট হবে বলে মনে করা হত । নীচু জাতির লোকেদের ছোঁয়া খাদ্য, জল উচ্চ জাতির লোকেরা খেত না ।

ভারতীয় মুসলিম সমাজেও জাত-পাত, ভৌগোলিক, আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত ভাগ ছিল। যদিও ইসলামের মহান বাণী ছিল সকল মুসলিমের সামাজিক সাম্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা রক্ষা করা হত না । শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে ভয়ানক বিরোধ ছিল । ভৌগোলিক ভেদে ইরানী, তুরানী, হিন্দুস্থানী এবং আফগান অভিজাত ও তাদের অনুচরদের মধ্যে বিরোধ ছিল । বহু হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হলেও হিন্দু সমাজের জাতিগত সংস্কার মেনে চলত। মুসলিম সমাজে 'শরিফ' সম্প্রদায়ের মুসলিমরা, হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতই সাধারণ শ্রেণির মুসলমানদের নীচু চোখে দেখত। শরিফ সম্প্রদায় থেকে মৌলভী, উলেমা, অভিজাত প্রভৃতি নিযুক্ত হত ।

সমাজে পরিবার প্রথার বিশেষ প্রভাব ছিল, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ছিল কর্তা । পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পুত্ররাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল । নারীদের গৃহে মাতা, কন্যা, ভগিনী বা পত্নীরূপে জীবন কাটতে হত । সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কোন ভূমিকা স্বীকার করা হত না । ১৯ শতকের গোড়ায় ইউরোপীয় পর্যটক আবে দুবোয়া উল্লেখ করেছেন, 'হিন্দু রমণীরা যে কোন স্থানে, এমনকি জনাকীর্ণ স্থানে নির্ভয়ে যেতে পারত-- অলস, দুষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি ও চটুল মন্তব্য তাদের ওপর নিক্ষিপ্ত হত না ।' তবে সাধারণত নারীদের এমনভাবে রাখা হত যে তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হত না । উচ্চবিত্ত পুরুষরা বহুবিবাহে আসক্ত ছিলেন, অল্প বয়সে বিধবা হলেও নারীদের পুনরায় বিবাহের অধিকার ছিল না । হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিল, যা মূলত বাংলা ও রাজপুতানায় প্রচলিত ছিল । তবে কোন কোন জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল ।

পরিশেষে ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার কারণে সামাজিক গতিশীলতা ছিল না বলে অভিযোগ করা হয় । কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য খাটে না । কারণ বুকানন জানিয়েছেন গোঁড়া হিন্দুরা প্রায়ই দুঃখ করে বলেন নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মানুষ প্রায়ই তার জন্য নির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে না । জীবিকা অর্জনের তাগিদে তারা এমন সব পেশা গ্রহণ করছে যা তাদের করা উচিৎ নয় । অর্থাৎ সেই সময় থেকে পেশার পরিবর্তন সূচিত করেছিল । জাতিগত সাবেকি পেশা পরিত্যাগ করে অন্য পেশায় নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে সামাজিক গতিশীলতা ছিল । ভারতচন্দ্রের রচনায় চাষী-কৈবর্ত এবং চাষী-ধোপার উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় কৈবর্ত বা জেলে এবং ধোপারা নিজেদের পেশা ত্যাগ করে চাষের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন ।

----------0----------

Model Question (Marks - 5)

১) অষ্টাদশ শতকে কি কৃষি ও শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছিল ?

২) সামাজিক ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের প্রভাব আলোচনা করো ।